কথক ও কথকথা

ড. কালী চরণ দাস ও প্রবীর আচার্য

সুবল মিত্রের অভিধানে আছে কথক মানে পাঠক, ধর্মভাণক, বক্তা, কথোপজীবী ইত্যাদি। অর্থ বিস্তারে অনেকে আবার লেখেন–কথক হল এক ধরণের সম্প্রদায় যাঁরা নৃত্যগীতাদি সহযোগে পুরাণ, ভাগবত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অভিনয়-সহ বর্ণনা করে থাকেন। বর্তমান কালে কথক সম্প্রদায় রয়েছেন এবং অনেকে কথকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণও করেছেন। বহু প্রাচীনকালে কথকতার ধরণটা হয়ত এরকম ছিল না ঠিকই কিন্তু কথকতা ছিল। অনুমান– বেদ, বিশেষত সামবেদ কথকতার বৈশিষ্ট্য নিয়েই লেখা বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। আর তার মূল প্রচারক হিসেবে কনৌজি ব্রাহ্মণদের ভূমিকার কথা অনেক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে।[১] ওদিকে, বলা বাহুল্য, বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ একটি অতি প্রাচীন গ্রন্থ, বেদের পরেই তার স্থান। গ্রন্থটি শুরুই হয়েছে কথকতার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গটা এরকমের–

নারদের আশ্রম। তপস্যা আর বেদ পাঠ নিয়ে তিনি সময় কাটাচ্ছেন। একদিন সেখানে বাল্মীকি এসে হাজির। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– প্রভু ! পৃথিবীতে কি, এমন কোনও পুরুষ আছেন যিনি সর্বগুণ সমন্বিত ? নারদ বললেন– আছে। অবশ্যই আছে। ইক্ষ্বাকু বংশে রাম নামে তিনি ইতিমধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর রাজ্যে প্রজাগণ সত্যযুগের মতো পরম শান্তিতে বসবাস করছেন, গিয়ে দেখতে পার। নারদ সবিস্তারে সেই রামকথা বাল্মীকিকে শুনিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। বাল্মীকি তখন আসন ছাড়লেন। তমসা নদীতে স্নান করলেন। তারপর উঠে আসছেন এমন সময় দেখতে পেলেন-এক ব্যাধ মিথুনরত ক্রৌঞ্চ পাখির পুরুষটিকে বধ করে ফেলেছে। দুঃখ -কাতর বাল্মীকির মুখ থেকে হঠাৎ তখন বেরিয়ে এল সুললিত এক সংস্কৃত শ্লোক

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্।।

শ্লোকটি শুনে তিনি নিজেই বড় অবাক এবং উন্মনা হয়ে গেলেন। এমনটা কেন হল ! ঠিক তখনই ব্রহ্মা এসে হাজির। তিনি বললেন- অবাক হয়ো না হে বাল্মীকি, তোমার মুখ দিয়ে আমিই ওই শ্লোক বলিয়েছি। তুমি এরকমের শ্লোক লিখে রামচরিত রচনা করো।

তারপর রামায়ণ লেখা হল। কিন্তু তা কীভাবে প্রচার করবেন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন বাল্মীকি। ঠিক তখন অপূর্ব সুন্দর দুই বালক লব ও কুশ তাঁর সম্মুখে এসে হাজির। বাল্মীকি সস্নেহে বালকদ্বয়কে কাছে টেনে নিলেন এবং পরম বাৎসল্যে রামায়ণ গান শেখালেন। তারা ওই গান গেয়ে বনবাসী মুনিদের তৃপ্ত করতে থাকলেন। সপ্ত সুরে ও বিলম্বিত লয়ে বীণা ও মৃদঙ্গাদি-সহ পথে পথে গেয়ে বেড়াতেন। একদিন স্বয়ং রামচন্দ্র শুনলেন তাঁদের গান। মুগ্ধ হলেন। রাজসভায় ডেকে এনে সকলকে তাঁদের গান শোনালেন ইত্যাদি। উপাখ্যানটা এভাবেই শুরু হয়েছে। তাই বলা চলে মূল রামায়ণে বাল্মীকি, লব ও কুশের কথকতার মধ্যে দিয়েই রামচরিত প্রকাশ করেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা দেখা যাক্। সেখানে কিন্তু শুরুটা হচ্ছে অন্যভাবে। দেখা যাচ্ছে– গোলোকে শ্রীনারায়ণ রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই চার অংশে বিভাজিত হয়ে বসে আছেন। আর একপাশে রয়েছেন সীতাদেবী। অদ্ভুত দৃশ্য। এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা না - পেয়ে নারদ ব্রহ্মাকে নিয়ে হাজির হলেন স্বয়ং শিবের কাছে। শিব স্মিত হেসে বললেন, অবাক হয়ো না হে, ষাট হাজার বছর পরে এমনটাই ঘটবে। তুমি সে-দৃশ্যই দেখলে। বুঝেছো ? এখন তাহলে ফিরে যাও, পথে তোমাদের সঙ্গে এক পাতকীর দেখা হবে। ইত্যাদি। এরপর চিরপরিচিত রত্নাকরের গল্প শুরু হল, ব্রহ্মার দয়ায় উইয়ের ঢিবি থেকে উদ্ধার পেলেন রত্নাকর। বাল্মীকি হয়ে জপতপে মনোনিবেশ করলেন। তারপরেই ক্রৌঞ্চবধ শ্লোকের অবতারণা ও রামায়ণ রচনা। বলা বাহুল্য কৃত্তিবাসী রামায়ণেই মাত্র রামচন্দ্রের জন্মের পূর্বে রামায়ণ রচনার কথা আছে।

তারপরেই সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রমে বনবাসে আসবেন, লব ও কুশের জন্ম হবে, তাঁদের শেখানো হবে রামায়ণ গান। কাহিনি অনুযায়ী লব-কুশের হাতে রামের মৃত্যু ও বাল্মীকির আশীর্বাদে পুনর্জীবন-লাভ। তারপর রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে লব-কুশ ও ঋষিগণ সহ বাল্মীকি রামের রাজসভায় উপস্থিত হবেন। লব-কুশের রামায়ণ গান শুনতে শুনতে সীতার দুঃখে আকুল হয়ে সীতাকে রাজসভায় আনানো হবে। তাঁকে পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার কথা বলা হলে তিনি পাতালে প্রবেশ করবেন ইত্যাদি। অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণে লব ও কুশের কথকতা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। দেখা যায় মহাভারতেও তার ব্যতিক্রম নেই, কথকতা সেখানেও।

ব্যাসদেবের মূল সংস্কৃত মহাভারতের কথা ধরা যাক্। অনুবাদ করেছেন শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সেখানে মহাভারতের উপাখ্যান শুরুই হচ্ছে কথকতার মধ্যে দিয়ে। কথক হলেন সৌতি উগ্রশ্রবা। ঘটনা এরকমের– শৌনক আদি ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে বারো বছরের যজ্ঞ শুরু করেছেন এমন সময় হাজির হলেন সৌতি উগ্রশ্রবা। মুনিরা উঠে দাঁড়িয়ে কুশল বিনিময়ে পর জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কোথা থেকে আসছেন। সৌতি বললেন-জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞ চলছিল, বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন মহাভারতের কাহিনি শোনাচ্ছিলেন। সেই কাহিনি পুরোটা শুনে, নানা তীর্থ ভ্রমণ করে তিনি এই তো নৈমিষারণ্যে এসেছেন। মুণিগণ মহাখুশি। তাঁরা বললেন-আপনি বেদব্যাস রচিত ও বৈশম্পায়ন কথিত যে উপাখ্যান স্বকর্ণে শুনেছেন তা আমাদের শ্রবণ করান। সৌতি ব্যাসাসনে বসে কথকতার মাধ্যমে শুরু করলেন মহাভারতের কাহিনি। এই হল মূল মহাভাতের সূত্রপাত।

কাশীদাসীতেও ব্যতিক্রম তেমন কিছু নেই। শৌনকাদি ঋষিগণ রয়েছেন, বারো বছরের যজ্ঞ চলছে। লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি সেখানে উপস্থিত হলেন। মুনিগণ জিজ্ঞেস করলেন–

কোথায় বা এতকাল করিলা যাপন।
সবিস্তারে কহ সবে করিব শ্রবণ।

সৌতি পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞের কথা বললেন, ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন ভারত কথা শোনালেন, তাও বললেন, তারপর নানা দেশ ভ্রমণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, সে-কথাও বললেন। মুনিরা তখন তাঁকে অনুরোধ করলেন—

নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করছে শ্রবণ।।
তার পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি সেকারণ।
কী জানহ কহ তমি করিব শ্রবণ।।
শুরু হল মহাভারতের কথা, কথকতা।

শ্রীমদ্ভাগবতও কথকতা দিয়ে শুরু হয়েছে বটে তবে ঘনায় কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন— বলদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। নানা তীর্থ ঘুরে উপস্থিত নৈমিষারণেও। ঋণিগণ দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রয়েছেন, বলরামকে দেখে তাঁকে সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ব্যাস শিষ্য রোমহর্ষণ ব্যাসাসন থেকে উঠলেন না। বললাম রেগে আগুন। কুশাক্রা দিয়ে তাঁর মুন্ডচ্ছেদ করলেন। মুনিগণ মহাপাপের ভয়ে ত্রস্ত, বলরামেরও ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এসেছে। একটা বিহিত করতে হয়। তাই তিনি বললেন— বেদে উপদেশ অছে যে মানুষের আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। অতএব এখন একমাত্র উপায়, রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদের কথক হবেন। কাজেই এখানেও দেখা যাচ্ছে যে কথকতার মাধ্যমেই ধর্মচরিতের শুরু হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাবগতে আরও কয়েক জায়গায় কথক এবং কথকতার প্রসঙ্গ আছে। যেন প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে, যকে মঙ্গালচরণ বলা হয়ে সেখানে। পরাশর নন্দ ব্যাস বহু পরাণ লিখেছেন, বহু শাস্ত্র পরেছেন কিন্তু তৃপ্তিলাভ করতে পারেননি। দেবর্ষি নারদ তাঁকে শ্রীমদ্ভাবত রচন করতে উপদেশ দিলেন। ব্যাসদেব তখন বলছেন— মহর্ষি নারদ পরমানন্দ রসপূর্ণ এই ভাগবত বৈকুন্ঠধাম থেকে এনে আমাকে দিয়েছেন। আমি তা স্বীয় তনয় শুকমুখে অর্পণ করি। তাঁর মুখ থেকেই বিশ্বে এই পুরাণ প্রকাশ লাভ করুক। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এখানে কথক হচ্ছেন ব্যাসপুত্র শুকদেব এবং কথকতার মাধ্যমেই ভাগবত জনগণের মধ্যে প্রকাশ লাভ করছে। ব্যতিক্রম শুধু কথক ঠাকুরের নাম নিয়ে।

ভাগবতের আরেক জায়গায় ব্রহ্মশাপে জর্জরিত রাজা পরীক্ষিৎ রয়েছেন হরিদ্বারের ব্রহ্মকুন্ডে, সঙ্গে রয়েছেন দশ হাজার মুনি-ঋষি। ব্যাস নন্দন শুকদেব তাঁদের সম্মুখে সাতদিন ধরে ভাগবত পাঠ করলেন।

বলা বাহুল্য প্রচারের সুন্দর মাধ্যম হল কথকতা বা পাঠকতা। এবং ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত পাঠক হলেন কার্যত এক সূত-নন্দন, ব্রাহ্মণ তনয় নন? উল্লিখিত বেদের কথা অবশ্য আলাদা। পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে পুরাণ পাঠকদের বলা হয় পৌরাণিক। তাঁর পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থকে পাঠকতার মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এবং তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সঙ্গীত ও নাট্যরস মিশিয়ে তবে প্রদর্শনে নামেন।

বাংলাদেশে কথকতার প্রসার নিয়ে একটি কথা প্রচলিত আছে। গুপ্তযুগে লাট কর্ণাটক ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ব্রাহ্মণেরাই নাকি বাংলাদেশে কথকতা বা পাঠকতার সূত্রপাত করেন। ভাগবত-পাঠই ছিল সে-সবের মূল। অবশ্য পৌরাণিক কালের কথকতার বিশিষ্ট ধারা বজায় রেখে ভাগবত পাঠ-করা সম্ভব ছিল না। তারজন্য এক নতুন ধারা প্রবর্তন করতে হয়। সেখানে থাকে বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রাবল্য এবং প্রেমাকুল আবেগের মিষ্ট উচ্ছ্বাস। বেদ বা বেদান্তে স্বভাবতই তেমনটা চলে না।

নজির হিসেবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পাহাড়পুরের টেরাকোটার প্রসঙ্গ তোলেন। মূর্তিগুলির ভাবভঙ্গী বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ন বিশেষ ভাবে প্রসার-লাভ করেছিল। স্বভাবতই এঘটনার উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় যে সেযুগে রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা কথকতার মাধ্যমেই জন-সমাজে উপস্থাপিত করা হত।

দ্বাদশ শতকে এলেন জয়দেব। তাঁর গীতগোবিন্দ তো এক গেয় কাব্য বিশেষ। নাট্যরসে সিক্ত। কাজেই কথকতা তো থাকবেই। তারও আগে ১০৯০ থেকে ১১১০ খ্রিস্টাব্দে কাটোয়ার কাছে সিদ্ধলগ্রামে রঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের বালভীভুজঙ্গ ভট্টদেবের তৈরি মন্দিরে এক-শো জন বিদ্যাধরী বা দেবদাসী নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন বলে নজির আছে। জয়দেব নাকি তাঁদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার মৈথিলী সঙ্গীতজ্ঞ লোচন (১৯৮১ খ্রি নাগাদ) ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে মিথিলায় কথকতার উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাপতির কাছেই গান শিখেছিলেন কথক 'জয়ত' এবং তিনি বৈষ্ণবীয় ধারার ভক্তিসঙ্গীত ও নাট্যরস কথকতায় সঞ্চারিত করেছিলেন। শুধু তাই নয় রাজ্যেশ্বর মিত্র অনুমান করেন স্বয়ং বিদ্যাপতিও একজন সার্থক কথক ছিলেন। আর রয়েছে জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত বর্ণরত্নাকর। গ্রন্থটি কথকতার এক আদর্শ পুস্তক। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সেযুগে ধর্ম প্রচারের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম ছিল কথকতা।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কাল। বৃন্দাবনে রয়েছেন ছয় গোস্বামী। শ্রীরূপ গোস্বামীর সভায় ভট্ট রঘুনাথ গোস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করতেন প্রায়শ। অন্যতম প্রমাণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্লোক—

রূপ গোঁসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন।।
...পিকস্বর কন্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।।

এরপর শ্রীনিবাস আচার্যের যুগ। তিনি নিজেই একজন ভাগবত পাঠক। বৃন্দাবনী পাঠের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ও ছিল তাঁর। এমনকি

জীবিকা হিসেবে তিনি কথকতাকেই গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে-তাঁর শ্রীমুখে শ্রীভাগবত শুনে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। আবার শ্রীনিবাসের শিষ্যের নাম গোবিন্দদাস কবিরাজ। তিনিও কথকতার গায়কি ঢঙের মাধুর্য থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর কোনও কোনও পদে কথকতার প্রভাব অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আর এই কথকতার প্রভাবেই বাংলায় নতুন ঢঙের গানের উদ্ভব হয়। যা সনাতনী কীর্তন থেকে অনেকটাই আলাদা। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ছিল এক গেয় কাব্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা অবশ্য পরবর্তী কালের ঘটনা। চরিতামৃত পাঠ তখন বৈষ্ণবদের নিত্য কৃত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যাতেও ছিল গানের মুখ্য ভূমিকা যা আজও আছে। অনেকেই মনে করেন পদাবলি কীর্তনের সৃষ্টি কথকতা থেকেই।

ঊনিশ শতক। শুরু থেকেই কথকতা বা পাঠকতা বাংলায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। জয়নারায়ণ ঘোষাল তাই লেখেন—

কথকতা তরজাতে সারিতেও প্রচুর।
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর।[২]

অনেকে মনে করেন— কথকতার আদিস্রষ্টা ছিলেন গদাধর শিরোমনি, তাঁর শিষ্য কৃষ্ণহরি শিরোমনি, তৎশিষ্য রামধন তর্কবাগীশ। এভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কথকতার অস্তিত্ব চিহ্নিত করা যায়। আর অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ভারতচন্দ্র হলেন অতি জনপ্রিয় কবি। তাঁর কবিতাতেও যে সেযুগের কথকতার প্রভাব থাকবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিপরীতটাও সত্যি। অর্থাৎ কথকতার মধ্যে ভারতচন্দ্রে কবিতার চমক জায়গা করে নিয়েছে। ঠিক এভাবেই বাংলা সঙ্গীতে নিজস্ব সম্পদ টপ্পায় কথকতা ঢুকে পড়ে। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন সামন্তপ্রভু, ধনী বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ক্রমে কথকতা নেমে আসে কবিগানে, আখড়াই কিংবা হাফ আখড়াই গানে। নানা কারণে গ্রাম-গঞ্জে চন্ডীমন্ডপ-আটচালার বিলুপ্তি ঘটলেও কথকতা কিন্তু পুরোটা হারিয়ে যায় না বরং মন্দির, মন্ডপতলা, ধর্মস্থান কিংবা কোনও পুণ্য স্থানে স্থায়ী আসন করে নেয়। অন্যদিকে বহু শিক্ষিত মানুষ আজ প্রাণের আবেগে অথবা ধর্মচর্চার তাগিদে ওই কথকতাতেই আশ্রয় খোঁজেন। এভাবেই বেঁচে রয়েছে অতি প্রাচীন এক ধর্মীয় সংস্কার। শিল্পও বলা যায়।

সবশেষে কথকের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালের কথা বলাটা অসঙ্গত হবে না— ঊনিশ শতকে তো কথাই নেই, কৃষ্ণলীলা রামায়ণ গান মহাভারতের উপাখ্যান আদি নিয়ে জন-গণেশের নাচানাচি, রাজা জমিদারের দরবারে তাদের সম্মাননার পালা, প্রজারা তখন অভিভূত। ক্রমে দূরদর্শনের প্রভাবে এরকমের সুদিন আর থাকে না। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ লীলা আদি কথকতার রূপভেদ স্তিমিত হয়ে যায়। এমতো দুর্দিনেও বাংলার মন্দিরে মন্দিরে ধর্মগ্রন্থ পাঠের ধারাবাহিকতা কিন্তু একেবারে মুছে যায় না। কথক সম্প্রদায়ও কোনও না কোনও ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। সুখেদুখে গড়া তাঁদের জীবন চরিত তাই তুলে ধরাটা আজ আমাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই লেখা তারই এক আন্তরিক প্রতিবেদন। শুরু হোক্ ক্রমান্বয়ে—

কথকতার পণ্য-স্থান : প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠের জায়গা হিসেবে কাটোয়া পৌরসভার অন্তর্গত বেশ কয়েকটি স্থানের নাম করা যায়। যেমন— শাঁখারিপটির রাধা গোবিন্দ মন্দির, গৌরাঙ্গ মন্দির, সখীর আখড়া, মাধাইতলা, আতুহাটপাড়ার হরিমন্দির, তাঁতিপাড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ফরিদপুর কলোনির হরিমন্দির, ঘুঁটকিয়া পাড়ার শিব মন্দির, প্রান্তিক পাড়ার দুর্গা মন্দির স্টেডিয়াম পাড়ার বৈকালিক সংঘের মন্দির, মাধবীতলার কালাচাঁদ মন্দির প্রভৃতি। ওই স্থানগুলিতে নিয়মিতই কেউ না কেউ পাঠ করতে যান। তা-ছাড়া কিছু অনিয়মিত স্থানও আছে। যেমন— হরিসভাপাড়ার সতীমার আশ্রমে প্রতি শুক্রবার, কাঠগোলা পাড়ার দেবী মন্দিরে একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে, ঘোষেশ্বর তলায় প্রতি সোমবার, রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রতিদিন কথামৃত পাঠ ছাড়াও প্রতি শনিবার ভাগবত পাঠ হয়ে থাকে। তা-ছাড়া ভক্তদের বাড়িতে নানা রকমের উৎসবে এবং আগ্রহে ধর্মগ্রন্থ পাঠ তো আছেই। শ্রাদ্ধাদিতে গীতাপাঠ তো অবশ্য - কৃত্য।

প্রাচীন ও নবীন কয়েক জন কথকের নামোল্লেখ : কাটোয়া পরিমন্ডলে বৈষ্ণব প্রভাব বহুকালের প্রাচীন। তার উপরে এখানে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর নামে একটি মন্দিরও সেকাল থেকে চলে আসছে। গর্ভগৃহের বিগ্রহ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও জগন্নাথ দেবের সেবকও রয়েছেন যথারীতি। তাঁদের বাসস্থান মূলত মন্দিরকে ঘিরেই। সেখানে বহু খ্যাতনামা কথকের স্মৃতি অম্লান রয়েছে। তারমধ্যে স্বর্গীয় শিবমোহন গোস্বামী হলেন অন্যতম। ভাগবতী পাঠ ও ব্যাখ্যায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। ওদিকে ঘোষেশ্বর তলার অনাদিমোহন গোস্বামীর নামও সর্বজনবিদিত। তিনি শ্যামসুন্দর নামক একটি উচ্চমানের বৈষ্ণব পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। লিখেছেন নানা নামে নানা পুস্তক। তারমধ্যে আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, সাধন দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল চালাতেন এবং সেখানে নিজেও অধ্যাপক ছিলেন। এতদ্ অঞ্চলের বহু বৈষ্ণবের মন্ত্রগুরু ছিলেন তিনি। কথক হিসেবে তাঁর সুনাম এখনও অম্লান রয়েছে। বর্তমানের বহু কথকের তিনি আদর্শ। বসন্তবিহারী সরকারের নামও সে-সূত্রে স্মরণীয়। তাঁর বসতবাড়ি ছিল শান্তিনিকেতনের বাসা-পাড়ায়। চাকরি করতেন রেলে। প্রথম দিকে কোলকাতার আশেপাশে পদাবলী কীর্তন গেয়ে সুনামের অধিকারী হন। অবসর জীবনে বৈষ্ণব তীর্থ কাটোয়ার আতুহাট পাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। নতুন করে শুরু হয় ধর্মালোচনা ও কথকতা। তাঁর কথা কাটোয়ার মানুষ এখনও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ রাখেন। ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলি হলেন সেরকমের আরেকজন মানুষ। বহু কথকের গুরু, পদকর্তা, ভাগবত পাঠক, কীর্তনিয়া ও ভাগবত পাঠ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কী ছিলেন না তিনি! নিকট-স্মরণকালে ধর্মগ্রন্থের কথক হিসেবে আপতত ওই কয়েকজনের নামই প্রথমে মনে আসে। তা-ছাড়াও বর্তমানে স্বনাম খ্যাত কথকের সংখ্যাও কম নয়। কাটোয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী কথকের শুভ নাম এখন স্মরণ করা যায়। যেমন— সর্বশ্রী সুভাষ ঠাকুর, রামমোহন গোস্বামী, পার্বতী গোস্বামী, দুর্লভ গোস্বামী, দীপেন ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি প্রামাণিক, সনাতন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস ভক্ত, প্রণব ভট্টাচার্য, সনাতন সাহা, দুলাল চ্যাটার্জি, রাধাকান্ত মন্ডল, বলরাম মুখার্জি, রাধাচরণ গোস্বামী, ধানু গোস্বামী, পরেশচন্দ্র অধিকারী, গুরুপদ মন্ডল, সরোজ নারায়ণ ভাস্কর প্রমুখ। মহিলারাও কথকতার কাজে বেশ সুনামের অধিকারী তবে সংখ্যায় অনেক কম। কয়েকজনের নাম

এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন– বেণু দাস, কুমকুম প্রামাণিক, বূপা বিশ্বাস, তারাদেবী রায় প্রমুখ।

বলা বাহুল্য এখানে যে তালিকা উপস্থাপন করা হল সেটি সর্বার্থে পূর্ণতার দাবি রাখতে পারে না। অনিচ্ছাকৃত ভাবে হয়ত অনেকের নাম বাদ পড়ে গেছে। স্মরণে এলে তাঁদের নাম অবশ্যই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই দুরূহ কাজে যিনি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনিও হলেন একজন সার্থক কথক। তাঁর শুভনাম হল শ্রীসরোজ নারায়ণ ভাস্কর। তাঁকে দিয়েই কথকদের জীবনচর্চার বিবরণ শুরু হোক্।

সরোজ নারায়ণ ভাস্কর : সরোজবাবু বুকে পেসমেকার নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান। তাঁকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে কতটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। চিরকামুর সরোজবাবুর কথক হওয়ার কথা ছিল না মোটেই। কাটোয়ার স্বনাম খ্যাত প্রস্তর শিল্পী গোকুলচন্দ্র ভাস্করের তিনি হলেন গিয়ে পৌত্র। হাতুড়ি ছেনি নিয়ে পাথরের কাজও শুরু করেছিলেন যথাসময়ে। কিন্তু কালের কটাক্ষে হাতুড়ি-ছেনির বদলে তাঁকে হাতে তুলে নিয়ে হয় শ্রীমদ্ভাগত, গীতা, আদি ধর্মগ্রন্থ।

পিতার নাম সিদ্ধেশ্বর ভাস্কর, মা কমলাবালা দেবী। জন্ম ২২ শে আষাঢ় ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। জন্মস্থান কোলকাতা গিরীশ পার্কের বাসাবাড়ি। শেষে কাটোয়া তাঁতি পাড়ার বৈতৃক বাড়িতে স্থায়ী বসবাস। বিদ্যালয়ের পাঠ কাটোয়া ভারতী ভবনে। ১৯৭৫ খ্রিস্বাব্দে বি.কম উত্তীর্ণ হন কাটোয়া কলেজ থেকে। তারপর বেকার সরোজবাবু কোলকাতা রওনা দেন প্রস্তর শিল্পী বাবার কাজের সহায়ক হিসেবে। শিল্প কর্ম দেখিয়ে মেলায় মেলায় ঘোরা, কিছু পুরস্কার আর কিছু সম্মাননা। প্রস্তর শিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তখন উঁকি দিচ্ছে তাঁর মনে। দুর্ভাগ্য, ১৯৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে দেখা দিল দুরারোগ্য হাড়ের অসুখ। পাথর কুঁদে শিল্প গড়ার ভারী কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ছবি আঁকা বা পট অঙ্কন জাতীয় হাল্কা শিল্পে পেটের ভাত হয় না তখন। কাজেই আবার শুরু হয় বেকারত্ব। এভাবে তো দিন চলে না। তাই নতুন উদ্যম হিসেবে শুরু হয় কথকতা।

পথচলার প্রথম সোপান গীতাপাঠ। তিনি যখন সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, তখন ঠাকুরমার গীতা পাঠ শুনে তাঁরও ইচ্ছে হয় গীতা পাঠের। বিষণ্ণ মুখে তিনি বলেন, সে ইচ্ছাই বুঝি শেষ অবধি পূর্ণ হল আমার। তাই বলা চলে ঠাকুমার উদ্যোগেই তাঁর কথকতা-শিক্ষা শুরু। অতীত ছবি মনে আছে। সাল ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ, ঠাকুরমা শয্যাশায়ী। গীতা গ্রন্থটি তিনি তখনও পুরোটাই মুখস্ত বলতে পারেন। শেখার উদ্দেশ্যে পাশে বসে সরোজবাবু তখন গীতা, ভাগবত, গীতগোবিন্দ আদি গ্রন্থ পাঠ করে শোনাতে থাকেন। প্রয়োজন মতো ঠাকুমার তাতে সংশোধন করে দেন। এভাবেই চলে কথকতার ক্লাস।

১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দের কথা। বাবা কোলকাতার বরানগরে ন'পাড়ায় রয়েছেন। তাঁর কাছে পাথরের কাজ শিখতে গিয়ে দেখা হয়েছিল তারাশঙ্কর মুখার্জির সঙ্গে। তিনি কী করে জেনে ফেলেছিলেন ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রাথমিক শিক্ষা সরোজবাবুর আছে। মূলত তাঁর প্রেরণাতেই বাগানবাড়িতে সর্বসাধারণের সামনে ভাগবত পাঠ প্রথম শুরু হয়। উৎসাহের সঙ্গে প্রচুর ধর্মগ্রন্থ কিনে ফেললেন। উদ্দেশ্য কথকতা। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার ফিরে আসতে হয় কাটোয়া বাড়ি, ঠাকুরমা তখন নেই। জীবিকার প্রয়োজনে এবার সত্যি সত্যিই পেশা হিসেবে শুরু হয় কথকতা। স্থান তাঁতিপাড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। বিশেষ ভাবে তালিম পান পঞ্চতীর্থ ও বৈষ্ণব দর্শনের পন্ডিত গীতার টীকাকার শ্রীগুরুপদ মন্ডল মহাশয় কাছ থেকে। তিনি চাকরি করতেন ভারতীয় রেলে। তা-ছাড়া উৎসাহ পেয়েছেন অনেকের কাছ থেকে। যেমন– রামমোহন গোস্বামী, ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলি, অমিয় চক্রবর্তী, দীপেন ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী প্রমুখ। তাঁরা নিজেরাও খ্যাতনামা কথক। প্রতিবেশী অমিয় চক্রবর্তী শুধু শিক্ষাই দেননি নানা রকমের বই দিয়েও সাহায্য করেছেন। উৎসাহ দাতা হিসেবে আরও অনেকের নাম রয়েছে। যেমন–গৌরাঙ্গবাড়ির শ্রীমোহন ঠাকুর, তাঁর কাকা শিবু গোস্বামী প্রমুখ। শিবু গোস্বামীর পাঠ সরোজবাবু খুব মন দিয়ে শুনতেন, পরবর্তী কালে তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এছাড়াও আরও অনেকের নামই করা যায়। সনাতন সাহা হলেন তাঁদের অন্যতম। এভাবে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও উৎসাহকে পাথেয় করে সরোজবাবু প্রায় পঁচিশ বছর ধরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মতে ভাগবত পাঠ করে ভক্তি চর্চা হয় বটে তবে জীবিকা হিসেবে এটি মোটেই সুবিধের কিছু নয়। উপার্জন বড়ই সামান্য। শুধু শ্রোতা সাধারণের প্রণামী। মন্দির কর্তৃপক্ষ সাধারণ কোনও সম্মান-দক্ষিণা দেন না। ব্যতিক্রম দু-এক জায়গায় হয়ত আছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বই কিছু না। যেমন সাধারণত প্রতি পাঠে ভক্তদের গড়ে প্রণামী পড়ে বড়ো জোর পঁচিশ ত্রিশ টাকা। শ্রাদ্ধ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে আয় অবশ্য কিছু বেশি হয়। সঙ্গে পাওয়া যায় ভোজ্য, বস্ত্র, তৈজস -পত্র ইত্যাদি। কাজেই যাঁরা সখের কথকতা করেন তাঁদের কথা আলাদা কিন্তু যাঁরা বাধ্য হয়ে এটিকেজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের দুঃখের কোনও লাঘব হয় না। পুরোহিত সম্প্রদায়েও আজ তেমনি দশা।

সরোজবাবু প্রতিদিন মোটামুটি দু-দফায় পাঠ করেন। যেমন তাঁর পাঠ থাকে সাধারণত সন্ধে পাঁচটায় ও সাতটায়। সূচি এরকমের– রোববার আতুহাটপাড়ার শিব মন্দির ও মাধবীতলার কালচাঁদ মন্দির। সোমবার তাঁতি পাড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির এবং রাধাগোবিন্দ মন্দির। মঙ্গলবার ফরিদপুর কলোনি হরিসভা মন্দির ও ঘুটকিয়াপাড়া শিব মন্দির। বুধবার বৈকালিক সংঘ ও প্রান্তিক পাড়া দুর্গা মন্দির ও গৌরাঙ্গপাড়ার রাধাকান্ত মন্দির। শুক্রবার হরিসভাপাড়া ডালিমের বাড়ি ও সখীর আখড়া। শনিবার আতহাট পাড়া শিবমন্দির ও ঘুটকেপাড়া শিবমন্দির। আপাতত এই সূচি অনুসরণ করেই সরোজবাবুর দিন কাটে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্ত

কতকতায় উচ্চ শিক্ষিত মানুষের আনাগোনাও কম নেই। সেরকমেরই একজন মানুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্ত, অবিবাহিত জন্ম ১৫ নভেম্বর, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ। পিতা হরিদাস ভক্ত, মাতা লক্ষ্মীসুন্দরী দেবী, নিবাস কাটোয়া হাজরাপুর কলোনি ওরফে অজয় পল্লি। মাধ্যমিক শিক্ষা পুরুলিয়া সৈনিক বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন থেকে ইংরেজিতে এম.এ এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে পি-এইচ. ডি। চাকরির শুরু কোশীগ্রাম ইউনিয়ন স্কুলের সহকারী শিক্ষকতা। বর্তমানে হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক।

শ্রীকৃষ্ণবাবুর পরিবারেরা পূর্ব বঙ্গের মাদারিপুর মহকুমার চরধুড়াইল গ্রাম থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকি ভাবে এখানে চলে আসেন। পিতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ধর্মগ্রন্থ-পাঠ তাঁর নিয়মিত কৃত্য ছিল। শ্রোতা ছিলেন প্রতিবেশীরা। বিনা দক্ষিণায় তিনি ধর্মের মূল তত্ত্ব বোঝাতেন। বিশ্বাস ছিল ধর্মগ্রন্থ বর্ণিত আখ্যন-উপাখ্যানগুলিই দুঃখময় এ সংসারের একমাত্র সান্ত্বনা। কৃষ্ণদাসবাবুর কথকতার মূল প্রেরণা তাই তাঁর পিতাই। তারপর গোপন সাধনা। আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে শাঁখারি-পাড়ার রাধাগোবিন্দ মন্দিরে। গুরু হিসেবে সাধারণত তিনি রামমোহন গোস্বামী ও ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলির নাম করে থাকেন। রামমোহন গোস্বামীকে আরও একটি ব্যাপারে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। কেন-না তিনিই নানা রকমের শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেন যে অব্রাহ্মণ কথকদেরও শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠে কোনও রকমের বাধা থাকার কথা নয়। অথচ গৌরাঙ্গবাড়িতে অব্রাহ্মণদের ব্যাসাসনে বসার অনুমতি দেওয়া হয় না। কৃষ্ণদাসবাবু দুঃখের সঙ্গে বলেন এরকমের কুসংস্কার স্বভাবতই শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তাঁরাও অব্রাহ্মণ পাঠকদের মনেপ্রাণে স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেন। অবশ্য কৃষ্ণদাসবাবুর পাণ্ডিত্য ক্রমশ তাঁদের বশীভূত করতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের প্রশ্ন তাঁরা অচিরেই ভুলে যান।

কথকতা একক, যৌথ বা সম্মিলিত ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণবাবু বহু জায়গায় শ্রীরামমোহন গোস্বামী, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ও শ্রীপরেশ অধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে যৌথভাবে পাঠ করেছেন। আপাতত আতুহাট পাড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, পানুহাটের রাধারানী মন্দির, ফরিদপুর কলোনি হরিসভা মন্দির ও বেগুনকোলের মনোহর দাসের পাটবাড়ির মধ্যে তাঁর কথকতা সীমাবদ্ধ রাখেন। আসলে তিনি কাটোয়ার বাইরে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন তাই তাঁর সময়ের বড়ো অভাব।

উচ্চ শিক্ষিত কৃষ্ণদাসবাবুর ধ্যান-ধারণার একটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে। তাঁর ধারণা– কথকতাকে শুধু তাৎক্ষণিক বিনোদন বিহেবে দেখলে ভুল হবে। এটি শ্রোতার মনের আধ্যাত্মিক স্তর উন্নত করে যা ক্রমে দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়ে পৌঁছয়। প্রেরণা হয় সুদূর প্রসারী। স্বভাবতই সেদিনের পাঠ্য পুস্তকেই তাঁর ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি মহাভারত রামায়ণ ছাড়াও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে সুন্দর সুন্দর উপাখ্যানের সাহায্য নেন। তবে তিনি স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না যে কথকতা কোনও মৌলিক সৃজন মূলক সংস্কৃতি নয়। এ হল পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে সামনে এগিয়ে চলা ও মানসিক শান্তির রসদ খোঁজা। কথকতার একঘেয়েমি কাটাতে তিনি তাই প্রায়শ রবীন্দ্র চর্চায় মন দেন। তার প্রভাব কথকতাতেও পড়ে।

এই নেশার অভিজ্ঞতা হিসেবে তিনি বলেন– মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, অনাদিমোহন গোস্বামী, ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবনের আনন্দদাস বাবাজী আদি কথকেরা তাঁর জীবনের আদর্শ। শ্রোতা সম্পর্কে তাঁর মতামত– শ্রোতাদের মধ্যে বরিষ্ঠরাই বেশি অমনোযোগী, তুলনায় নবীনেরা অনেক বেশি সচেতন। শ্রোতাদের মধ্যে অব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি এবং মহিলারাই। পাঠ শেষে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে বহু প্রশ্ন উঠে আসে। তাৎক্ষণিক উত্তর জানা না-থাকলে পরের দিন উত্তর দিয়ে তাঁদের তৃপ্ত করতে হয়। তাতে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণবাবুর কোনও বিরক্তি নেই বরং খুবই আনন্দ উপভোগ করেন। আরও ভালো লাগে যখন দেখা যায় শ্রোতারা তুলনামুলক আলোচনাতেই বেশি আগ্রহী। বলা বাহুল্য এই পদ্ধতিতেই জ্ঞানের পরিসীমা বিস্তৃতি লাভ করে। দশ থেকে কুড়ি শতাংশ শ্রোতা বিষয়টিকে বাড়িতে অনুশীলন করেন বলে তাঁর ধারণা এবং বিষয়ও বেশ স্মরণে রাখেন। এটি একটি শুভ লক্ষণ।

সকলের মতো তিনিও পাঠের আগে বিষয়-বস্তু সাধ্যমতো ঝালিয়ে নেন। কথকদের অনেকে প্রচুর শ্লোক মনে রাখতে পারেন। বলা বাহুল্য এটি তাঁদের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল। কৃষ্ণবাবু সবে শুরু করলেও তাঁর সঞ্চয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাটের মতো শ্লোক এখনই মুখস্থ হয়েছে। সাধারণত কথকতার আসরে রামায়ণ মহাভারত বা বেদ মূল গ্রন্থ হিসেবে পাঠ করা হয় না, ব্যবহার হয় সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে। এর কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেন– আসলে ওই গ্রন্থগুলি একালের শ্রোতাদের মনের আধ্যাত্মিক চাহিদাকে পুরোপুরি পূরণ করতে পারে না। তা ছাড়া পাঠের বিষয়-বস্তুকে লঘু করে ফেললে শ্রোতাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। তাঁর ধারণায়– শ্রোতাদের বিজ্ঞান মনস্কতা অবশ্যই কাম্য। তাতে পাঠের সুবিধা হয়। তুলনা মূলক শিক্ষাই হল আসলে সফল শিক্ষা। কেন-না বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের তো কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, থাকারও অবশ্য কথা নয়।

রামমোহন গোস্বামী

আরেক উচ্চ শিক্ষিত কথকের প্রসঙ্গ তুললে রামমোহন গোস্বামীর কথা এসে যায়। তিনি হলেন নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধর। গঙ্গাদেবীর স্বামীর নাম মাধব চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের পুত্র হলেন প্রেমানন্দ গোস্বামী। কথিত আছে প্রেমানন্দ ভ্রাম্যমাণ বিগ্রহ রাধামাধবকে প্রথমে শাঁখাই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামমোহনবাবু নিজেকে নিত্যানন্দের চতুর্দশ পুরুষ বলে দাবি করেন। তাঁর পিতার নাম জ্ঞানগোপাল গোস্বামী, মাতা ধর্মদাসী দেবী। ঠাকুরমা হরিপ্রিয়া দেবী আর ঠাকুরদা হলেন রাধারমণ গোস্বামী। রাধারমণবাবু ছিলেন একজন খ্যাতনামা পাঠক ও কীর্তনিয়া। তাঁদের আদি বাড়ি মঙ্গলকোট থানার ভাল্যগ্রাম। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রামমোহনবাবুর বাবা কাটোয়ায় বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। সে-থেকে তাঁরা কাটোয়ায়।

রামমোহনবাবুর জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ। তিনি সংস্কৃত অনার্স-সহ এম.এ.বি.এড। বাংলাতেও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আছে। এ-ছাড়া নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় থেকে বৈষ্ণব দর্শন তীর্থ উপাধি অর্জন করেছেন। অনাদি গোস্বামীর গৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠীতে তিনি পড়েছিলেন। সে-সূত্রে তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং কথকতা শিল্পটি করায়ত্ত করেন। পেশা হিসেবে কাটোয়া রামকৃষ্ণ স্কুলের সহকারী শিক্ষক এবং তারসঙ্গে কাটোয়া কলেজে সংস্কৃত বিভাগের আংশিক অধ্যাপক। সেকারণে কথকতা বিষয়টি নিয়ে বেশি এগোনো সম্ভব হয় না, সময়াভাব। তাতেও কথক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতির শেষ নেই। দূর দূরান্ত যথা, নবদ্বীপ রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, বেহালা, চারকলগ্রাম ইত্যাদি জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসে। অতীতে তিনি সেসব জায়গায় যেতেন। এখন সময়াভাবে যেতে পারেন না বলে দুঃখ অনুভব করেন। বর্তমানে তাই তিনি ব্যক্তি সাধারণের বাড়িতে সপ্তাহে দু-একদিন, গৃহ-প্রবেশ, শ্রাদ্ধ, বাৎসরিকী ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত পাঠক হিসাবে যেতে বাধ্য হন।

অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন না। একটানা দেড় ঘন্টা ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, গীতা বা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। এছাড়া বর্তমান রবিবার গৌরাঙ্গ মন্দিরে ও শনিবার রাধাগোবিন্দ মন্দিরেও যান। তাঁর কথকতার আকর্ষণে প্রায় দুশো আড়াই-শো জন শ্রোতা হাজির হন। মহিলারা স্বভাবতই সংখ্যায় বেশি।

সকল গ্রন্থেই দেখা যায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন সূত নন্দন, ব্রাহ্মণ কিন্তু নয়। অথচ নানা রকমের সংস্কারে বশীভূত হয়ে গৌরাঙ্গ বাড়ির কর্তৃপক্ষ সেখানে অব্রাহ্মণকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে অনুমতি দেন না। রামমোহন গোস্বামী মহাশয় এব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন। সুযোগ পেলেই তিনি তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না। প্রতিবাদ হিসেবে রাধামাধবের সেবার সময় নিজের বাড়িতে তিনি অব্রাহ্মণকে দিয়েই কথকতা করান। তা ছাড়া নিজের কথকতা করার সময় যে-অংশে জাতিভেদের কুফলগুলি আলোচিত হয় সে অংশগুলি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নানা রকমের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ করেন। কথকতা তাঁর নজরে এক ধরণের গণশিক্ষার আসর। কথকতা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা করে। সেকারণে আজকের দিনে প্রতিটি পাড়ায় কথকতার প্রসার হওয়া দরকার। এসব ভেবেই তিনি কোথাও কোনও সম্মান-দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। মানুষের ভক্তি মিশ্রিত শ্রদ্ধাটিই তাঁর জীবনের পাথেয়।

এমনিতেই তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী কথক, প্রচুর ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তাঁর সংগ্রহে, প্রায় তিন চার-শো সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ, যেখানে সেখানে ব্যাখ্যা হিসেবে আবৃত্তি করে সময় পার করে দিতে পারেন তবু তিনি বিষয়টিকে হাল্কা না-ভেবে পাঠের আগে একবার ঝালিয়ে নেন। বলা বাহুল্য এটি তাঁর চরিত্রের এক বিশেষ লক্ষণীয় দিক। ওদিকে শ্রোতারাও কিন্তু সহজ সরল বিষয়গুলি তুলনা মূলকভাবে বেশি মনে রাখেন এবং বারবার শুনতে চান, জটিল বিষয়ের প্রতি তাঁদের আসক্তি কম। এটাই হওয়া স্বাভাবিক। অনেকেই বলেছেন রামায়ণ বা মহাভারত তাঁরা মূল গ্রন্থ হিসেবে পাঠ করেন না। সহায়ক হিসেবে পঠিত হয়। কিন্তু চিরকালই তো গ্রামেগঞ্জে দেখেছি ওই দুটি গ্রন্থই অধিক শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। রামমোহন বাবু সে-ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন। যেমন, রামনবমীতে সংস্কৃত রামায়ণ ও অগ্রহায়ণ মাসে গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মূল সংস্কৃত মহাভারত তিনি পাঠ করেন। তাঁর নজরে আদর্শ কথক হলেন– প্রাণগোপাল গোস্বামী, অনাদিমোহন গোস্বামী, কেদারনাথ রায়, বাসন্তী চৌধুরী, রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। যদিও আজকের কাল হল বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞান মনস্কতাই একমাত্র কাম্য তবু তিনি তাঁর দুই পুত্র সৌভদ্র ও শৌনককে সার্থক কথক হিসেবেই দেখতে চান। পুত্রদেরও তাতে কোনও আপত্তির লক্ষণ নেই।

সুভাষ ঠাকুর

কাটোয়া এলাকায় কথক হিসেবে চিরকুমার সুভাষ ঠাকুর মহাশয়ের নাম জানেন না এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষিত কী অশিক্ষিত সব সমাজেই তাঁকে ভক্তির উচ্চ শীর্ষে বসানো হয়ে থাকে। কণ্ঠস্বর অতীব মধুর, জ্ঞান সমুদ্র গভীর, ভঙ্গী আন্তরিকতা আর ভক্তিতে পূর্ণ। কথায় কথায় উদাহরণ আবার উদাহরণের মধ্যে উদাহরণ, অনর্গল হিন্দি বাংলা সংস্কৃত শ্লোক। এই হলেন সুভাষবাবু। বর্তমান নিবাস মুর্শিদাবাদের মানিক্যহার। তারও আগে শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মতীর্থ নদিয়ার চাকুন্দি। সেখানেই ছিল তাঁদের পূর্বপুরুষের বাস। পিতার নাম বিনোদবিহারী ঠাকুর আর মা অন্নপূর্ণা দেবী। শ্রীনিবাস আচার্যের ত্রয়োদশ পুরুষ হিসেবে সুভাষবাবু নিজেকে দেখেন। তাঁর দীক্ষা হয় পিতামহ কিশোরীলাল ঠাকুরের কাছে। তিনিই ছিলেন কথকতার মূল প্রেরণা। ক্রমে নবদ্বীপ, কোলকাতা, বৃন্দাবন, কাটোয়া ও অন্যান্য জায়গার গোস্বামীদের কাছে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যায়নকালে তাঁদের আদেশেই কথকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। আর সে থেকে শুধু ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা। বয়স বর্তমানে ৬৪ বছর। এরমধ্যেই তিনি বৃন্দাবন, পুরী, নবদ্বীপ, হরিদ্বার, দিল্লি, কোচবিহার, বর্ধমন, মালদা, মেদিনীপুর ইত্যাদি জায়গায় আমন্ত্রিত হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে কথকতার আসর করে আছেন। এ-ছাড়াও ধর্মীয় সভাসমিতি, পারিবারিক অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ ইত্যাদিতে হামেশাই তাঁর আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু মূল বাধা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যতা। সেকারণে সিংহভাগ জায়গাতেই এখন আর উপস্থিত হতে পারে না। তাই বড়ো আপশোশ। দক্ষিণা গ্রহণ করেন সম্মানার্থে জীবিকার্থে নয়।

তাঁর মতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা এবিষয়ে তথ্যমুলক বক্তৃতা দেওয়ায় একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটানো। যা প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসার বাতাবরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাঁর কথকতা প্রদর্শনের সময় শিক্ষিত অশিক্ষিত নারী কিংবা পুরুষের ঢল নামে। শেষে প্রশ্নোত্তরের চল না -থাকায় অনেক শ্রোতাই অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যান। তিনি নিজেও অতৃপ্ত থাকেন। তিনি মনে করেন দূরদর্শনের জনপ্রিয়তার কারণে গ্রামের বা আধা শহরে বসবাসকারী কথকদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল নয়। তবে আশা করা ভালো যে এরকমের পরিবেশ চিরটা কাল থাকবে না। চিরকুমার সাধক সুভাষ ঠাকুর মহাশয় নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নীরব থাকতেই ভালোবাসেন। শ্রীআশীষ ঠাকুর মশায়ের প্রচেষ্টাতে কোনও মতে এটুকু ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে মাত্র। তাই এর বেশি কিছু লেখা গেল না, দুঃখ সেখানেই।

অমিয় চক্রবর্তী

শ্রীঅমিয় কুমার চক্রবর্তী। তাঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে মিশে আমাদের মনের মধ্যে একটা শ্লোকই বারবার ঘুরে ফিরে আসে।–

দুঃখেস্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।

ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত। অতএব উল্লেখ থেকে নিরস্ত থাকতে হয়। অসাধারণ ব্যক্তি হলেন শ্রীচক্রবর্তী, গোপনীয়তা কাকে বলে তা বুঝি তিনি জানেন না। তাই কথক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি যেভাবে শ্লোকের পর শ্লোক ছাত্রের মতো মুখস্ত করেছেন তাও উল্লেখ করতে ভোলেন না। তারপরই স্মিত হাস্য।

নাম শ্রীঅমিয় কুমার চক্রবর্তী, পিতা বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, মাতা প্রভাবতী দেব্যা, পিতামহ শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, পিতামহী উমারানী দেব্যা, জন্ম তারিখ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। আদি পৈতৃক বাড়ি কাটোয়া তাঁতিপাড়া। তাঁর স্ত্রী হলেন মুকুল রানী দেব্যা, পাঠের গুরু তথা দীক্ষগুরু

হলেন ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আদি বাড়ি বীরভূমে, পরবর্তীতে কাটোয়া। দীক্ষা দেওয়া ও ধর্মগ্রন্থ পাঠই ছিল তাঁর পেশা। এছাড়াও অমিয়বাবু অনাদিমোহন গোস্বামীর কৃপাধন্য এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ যোগ্যতা হল বাংলায় স্নাতক। বিশেষ বিষয় বৈষ্ণব দর্শন, কাছাকাছির মধ্যে এরকমের সুযোগ নবদ্বীপ কলেজেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান তাঁর কথকতার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে দিয়েছে। বিয়াল্লিশ বছর শ্রীচক্রবর্তী প্রধান শিক্ষকতা করেন কাটোয়া পৌরসভার অন্তর্গত গোবিন্দচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে শাঁখারি পাটির রাধাগোবিন্দ মন্দিরে তিনি প্রথম কথকতা শুরু করেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠকে পেশা হিসেবে কোনও দিন গ্রহণ করেননি বলে সম্মান-দক্ষিণা সাধারণত নেন না। তবে শ্রোতারা শ্রদ্ধা সহকারে কিছু দিলে তা গ্রহণ না-করাটা তাঁদের অবজ্ঞা করার সামিল হয় বলে প্রতীকী কিছু গ্রহণ করতে হয়। কথকতার আচার বলতে শুদ্ধ নিরামিষ আহার। ঘন্টা দেড়েক ধরে একটানা পাঠ করে থাকেন। শ্রোতাদের মধ্যে সবরকমের মানুষই থাকেন। তবে অব্রাহ্মণ ও মহিলাদের সংখ্যাটাই বেশি। তিনি পাঠ হিসেবে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সাধারণত বেশি পাঠ করেন। কোনও সময় একঘেয়েমিতে ভোগেন না। দুর্গা একাদশীতে ঝামটপুর বহরাণের পাটবানি, রবিবার মাধাইতলা, মঙ্গলবার শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, বুধবার সখীর আখড়া, শুক্রবার রাধাগোবিন্দ মন্দির। সোম আর বৃহস্পতিবারে আমন্ত্রিত পাঠ।

তাঁর মতে, পাঠের মধ্যে দিয়ে নিজের সমাজের আধ্যাত্মিক চেতনার বৃদ্ধি ঘটে। পাঠকও শ্রোতার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাই ভাগবত পাঠের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি কামনা করেন যে তাঁর বংশধরেরাও যেন কথকতার পরম্পরা বজায় রাখেন। বাড়িতে রয়েছে প্রচুর গ্রন্থ। কাজেই নতুন করে ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য কষ্ট করতে হবে না। শ্রোতা সাধারণ নানা রকমের প্রশ্ন করেন এবং কথকতার বিষয় অবশ্যই মনে রাখেন। বাড়িতেও তাঁরা অনুশীলন করেন। স্বভাবতই হাজার দুয়েক শ্লোক মনে রেখেও কথকতা করতে যাওয়ার আগে একবার ঝালিয়ে নিতে হয়। তাঁর মতে শ্রোতারা যদি বিজ্ঞানের ছাত্র হন তাতেও কথকতার মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের কোনও অনিষ্ঠ হয়নি, হলেও না। কারণ বিজ্ঞান বিষয়টাও মহান ঈশ্বরের সৃষ্টি। কথক হিসেবে শ্রোতাদের কাছ থেকে নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা তাই উপভোগের বিষয় হয়। অমিয়বাবুর বিচারে তাঁর কাছে আদর্শ কথক রয়েছেন বেশ কয়েকজন। যেমন— অনাদিমোহন গোস্বামী, বৃন্দাবনের আনন্দদাস বাবাজী, মাধাইতলার কৃষ্ণানন্দ দাসবাবাজী, সুভাষ ঠাকুর প্রমুখ। (ক্রমশ...)

তথ্যসূত্র ঃ—

১। বীরভূমের লোকভাষা, প্রবাদ-প্রবচন ও কথকতা : অসিত দত্ত : পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা - ফেব্রুয়ারি ২০০৬

২। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম : রমাকান্ত চক্রবর্তী : পৃ ১৬২

৩। খ্যাতনামা কথকদের সঙ্গে সতেজ সাক্ষাৎকারই এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয়।

বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষের কথকতা একটি প্রাচীন লোক সংস্কৃতি। কোন সেই বৈদিক যুগে এর উৎপত্তি। আগের সংখ্যায় এর ধারাবাহিক ইতিহাস এবং পাঁচজন স্থানীয় কথকের জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় তিনজন মহিলা কথক সহ মোট পাঁচজনের জীবনী প্রকাশিত হল।

পরেশনাথ অধিকারী : পূর্বপুরুষরা কেতুগ্রাম থানার নারাঙ্গা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। প্রায় ২৫০/৩০০ বছর আগে তাঁরা কাটোয়ার সিদ্ধেশ্বরীতলায় এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তাঁদের আদিপুরুষ নন্দদুলাল অধিকারীর বোনের শ্বশুরবাড়ি ছিল মুহুরিবাড়ি। সে-সূত্রে তিনি কাটোয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। নন্দদুলালবাবু রামায়ণ গান করতেন। তাঁর পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ তস্য পুত্র ভূপতিনারায়ণ এবং তস্য পুত্র হরিদাস। হরিদাসের পুত্র হলেন পরেশবাবু। পরেশবাবুর মাতার নাম সত্যবতী দেবী।

পরেশবাবুর জন্মতারিখ ২০শে আষাঢ় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬ খ্রি)। ১৯৬২ সালে কাটোয়ার ভারতীভবন স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর কাটোয়া কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ডিস্টিংসন সহ বি.কম. পাশ করেন। তারপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে এম.কম. পাশ। ইউ.জি.সি. রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা শুরু। কিন্তু ওই সালেই ইউকো ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে যাওয়ার সুবাদে গবেষণা আর সমাপ্ত হয় না। পরে তিনি সংস্কৃতে আদ্য মধ্য পাশও করেন। কলেজের সহপাঠী রামমোহন গোস্বামীর সঙ্গে নিভৃতে ধর্মালোচনা চলত তাঁর। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল দুজনের। ১৯৭৩ সাল নাগাদ তিনি জ্ঞানদাস কান্দরায় শম্ভু চট্টরাজের কন্যা মালবিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মালবিকা পিতার রেলে চাকুরির সূত্রে বিহার থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। পরে চণ্ডীগড় কলাকেন্দ্র থেকে বি.মিউজ.। মালবিকা ভালো কীর্তন গাইতে পারেন। সেই সূত্রে পরেশবাবু ১৯৮৩/৮৪ সাল নাগাদ একটি কীর্তনের দল খুলে ফেলেন। দল চালাতে হলে লোকজন যেমন দরকার তেমন দরকার সাজ সরঞ্জাম। ব্যাঙ্কে চাকরির সূত্রে সেগুলো ক্রমশ অসুবিধা সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে কীর্তনের দল বন্ধ হয়ে যায়।

ওদিকে বন্ধু রামমোহন গোস্বামী তখন কথকতা নিয়ে মেতে রয়েছেন। তিনি উৎসাহ দিয়ে কথকতার পথে পরেশবাবুকে টেনে আনেন বটে তবে প্রথাগতভাবে পরেশবাবু কারও কাছে কথকতার পাঠ নেননি। স্ত্রী মালবিকা দেবীও পরেশবাবুর কথকতায় উৎসাহ যোগান। এমনকী আসরে সাহায্য করতেও দ্বিধা রাখেননি। বৃন্দাবনে গিয়ে বিভিন্ন কথকদের নিকট পাঠ শুনেও যথেষ্ট প্রেরণা এবং জ্ঞান লাভ করেন। শেষে ১৯৮২ সালে বৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুদেবও তাঁকে প্রচুর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আবার কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জ্ঞাতি ভাই জ্ঞানচন্দ্র বক্সি ছিলেন একজন খ্যাতনামা কথক। তাঁর কাছেও পরেশবাবুর অনেক কিছু শিক্ষা। কথকতার তাগিদে প্রতিদিনই তিনি প্রচুর ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। এখন অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারেন। সঙ্গে বিভিন্ন ভাষ্যকারের টীকা অনুযায়ী নানা ব্যাখ্যাও। মূলত শ্রীমদ্ভাগবত সহ আনুষঙ্গিক গ্রন্থ হিসেবে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, রামায়ণ,

মহাভারত, গীতা ইত্যাদি থেকে পাঠ ও কথকতা হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বাড়িতে ধর্মশাস্ত্রের বিশাল সম্ভার। এখন কথকতা করতে যাওয়ার পূর্বে তাঁকে আলাদা ভাবে পড়াশুনা ঝালিয়ে নিতে হয় না। একনাগাড়ে প্রায় দেড় ঘন্টা কথকতা করেন। অধিকাংশই স্মৃতি থেকে।

নিয়মিতভাবে কাটোয়ায় তিনি কথকতা করেন শুক্রবার তাঁতিপাড়া লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে (বিকেল ৪.৩০ মি); শনিবারে গৌরাঙ্গ মন্দিরে (সন্ধ্যা ৭টা), রবিবারে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে (সন্ধা ৭টা) আর সোমবার সখীর আখড়ায় (সন্ধ্যা ৭টায়) বাকি দিনগুলিতে আমন্ত্রিত পাঠ। কথকতার জন্য তিনি কোনও দক্ষিণা নেন না। তবে কেউ সাম্মানিক দিলে প্রত্যাখ্যানও করেন না। ভক্তেরা প্রণামী দিলে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর মূল জীবিকা হল ব্যাঙ্কের চাকুরি।

শ্রোতাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। বর্তমানে অনেকে দূরদর্শনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে কথকতার আসরে আসতে শুরু করেছেন। এদের মধ্যে অল্প বয়সীর সংখ্যাই বেশি। এটা তাঁর কাছে আশাপ্রদ ঘটনা। মনোযোগী শ্রোতারা অনেক কূট প্রশ্ন করেন, অনেকে আবার বিতর্কও তোলেন বিভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে। খুব যত্নের সঙ্গে তিনি শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। না জানা থাকলে বাড়ি এসে পড়াশোনা করে পরের দিন সে-সমস্যা সমাধান করেন। তিনি শ্রোতাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাঁর পাঠের উদ্দেশ্য অধ্যাত্মবাদ প্রচার ও লোকশিল্প, যশের প্রত্যাশা নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে খ্যাতির বিড়ম্বনা এসে পড়ে এবং তা সহ্যও করতে হয়।

তাঁর বংশে কোনও গুরুগিরি ছিল না। কিন্তু গুরু পরম্পরায় বাধ্য হয়ে এখন তাঁকে দীক্ষাও দিতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধাচারী ও নিরামিষাশী। কথকতার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকার মানেন না। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাড়িতে ভাগবত সপ্তাহ পালন করেন। তখন অব্রাহ্মণদেরও তিনি ভাগবত পাঠের সুযোগ করে দেন। প্রতিদিন প্রায় চারশ মতো মানুষ ভাগবত সপ্তাহে অংশগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের নারায়ণ দাস, বৃন্দাবনের গৌরাঙ্গ শাস্ত্রী, পানুহাটের লালমোহন দেবনাথ, ঘোষহাটের ত্রিনাথ মিস্ত্রি প্রমুখরা পাঠ করতে আসেন।

পরেশবাবুর বাড়িতে বৈষ্ণবীয় পরিবেশ। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস করেন এবং দ্বৈতবাদকে অগ্রাধিকার দেন। ব্যক্তিগত ভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চান।

মৃণালকান্তি প্রামানিক : কেতুগ্রাম থানার চাকটা গ্রামের কাছে মাঝিনা গ্রামের মুরারিমোহন প্রামাণিক ও তাঁর স্ত্রী কুন্তলতা প্রামাণিক ১৯৫৬ সালে ব্যবসা সূত্রে কাটোয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। জাতিতে গন্ধ বণিক হওয়ার সুবাদে মুরারিবাবুর ধান চালের আড়ৎ, কয়লা ও মুদিখানার ব্যবসা ছিল। এছাড়াও কীর্তনে ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। প্রতিদিন কাটোয়া গৌরাঙ্গ বাড়িতে আরতি কীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন। এই মুরারিবাবু সন্তান হলেন মৃণালকান্তি কীর্তনীয়া। এই পদবীটাই তিনি বেশি পছন্দ করেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ৩০ তারিখে মৃণালবাবুর জন্ম। ১৯৫৬ সালে মুর্শিদাবাদের গয়সাবাদ স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর কাটোয়া কলেজ থেকে আই.এ। তারপরে ১৯৬০ সালে বোলপুর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে শান্তিনিকেতনে এম.এ.তে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৬১ সালে মুর্শিদাবাদের তালিবপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা পেয়ে যাওয়ায় এম.এ. আর সম্পূর্ণ হয় না। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি নিয়মিত কীর্তনের ক্লাসে যেতেন। সেখানেই কীর্তনের মনোহর শাহি ধারা বা শৈলীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৯৬৫ সালে কীর্তনের একটি দল গড়ে ফেলেন শিক্ষকতা করতে করতেই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার দলবল নিয়ে রীতিমতো রসকীর্তন পরিবেশন করে বেড়াতে থাকেন। তাতে শিক্ষকতার কাজ বিঘ্নিত হত বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কীর্তন করা ছেড়ে দেন। তবু কীর্তন তাঁকে ছাড়ে না। ১৯৭০ সাল নাগাদ তিনি শুরু করেন এককভাবে কথকতা, সঙ্গে একক কীর্তন। কাটোয়া তাঁতিপাড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে তাঁর প্রথম কথকতা। তালিবপুরের খুদিরাম ভট্টাচার্যের কাছে চলে কথকতার পাঠ, সঙ্গে কীর্তনেরও। মৃণালবাবুর পিতামহের ভাই গোষ্ঠবিহারী ছিলেন খোলবাদক। তাঁর কাছেও কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছেন তিনি। আর বাবার কাছে পেয়েছেন অনুপ্রেরণা।

মৃণালবাবুর কথকথা শোনা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তাঁর কথকতার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদী, কীর্তন, বাউল ইত্যাদি সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সঙ্গে চলে অপূর্ব নাচ। এই ৭৮ বছর বয়সেও তিনি নেচে নেচে আসর মাত করে দিতে পারেন। তাঁকে বই দেখে পাঠ করতে হয় না, অনর্গল মুখস্ত বলে যান। একদিন কাটোয়া সংশোধনাগারে কথকতার আসরে তাঁর নাচের সঙ্গে সমস্ত বন্দীরা যখন মহানন্দে নাচ শুরু করে দেয় তখন সংশোধানাগারের কর্তৃপক্ষের চোখ মুখ আশংকায় ভরে ওঠে। তবে শেষমেষ কোনওভাবেই শন্তি বিঘ্নিত হয় না। বরং সমস্ত বন্দীরা তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে থাকেন– তিনি যেন পুনরায় সেখানে কথকতা করতে আসেন।

যেখানেই আনন্ত্রণ পান, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেখানেই কথকতার আসরে হাজির হন এই বয়সেও। কোনও প্রণামী বা সাম্মানিকের দাবী নেই। তবে দিলে প্রত্যাখ্যান করেন না। তাঁর বিশ্বাস মানুষের মধ্যে কথকতার মাধ্যমে ভক্তিরসের সঞ্চার ঘটালে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তাতে মানুষের অপরাধ প্রবণতা কমে। ১২/১৩ বছর ধরে কাটোয়ায় তিনি নিয়মিতভাবে পাঠ করেন। রবিবারে পানুহাটের গুরুমিলন আশ্রমে (৫.৩০মি), বুধবারে কাটোয়ার রাধাকান্ত বাড়িতে (৬টা), বৃহস্পতিবারে সখীর আখড়ায় (৬.৩০ মি) এবং শুক্রবারে বিকেল পাঁচটায় আতুহাটপাড়া শিবতলায়। এছাড়াও আমন্ত্রিত পাঠ তো আছেই

তাঁর কথকতার মূল গ্রন্থ ভাগবত হলেও আনুষঙ্গিক ধর্মগ্রন্থগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত মেশাতে তিনি কোনও দ্বিধা বা সঙ্কোচবোধ করেন না বরং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করেন। কথকতার সঙ্গে প্রায় সব পদকর্তাদের পদই প্রয়োজন অনুযায়ী গাইতে থাকেন। বাড়িতে প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস বজায় রেখেছেন। অব্রাহ্মণ হিসেবে নিজের কোনও সঙ্কীর্ণতা নেই এবং জাতিভেদ প্রথাও মানেন না। শ্রোতাদের কূট প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন কারণ শ্রোতাদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। ব্যক্তিগত জীবনে মৃণালবাবু নিরামিষাশী এবং ধর্মপরায়ণ।

রমারানি প্রামাণিক : মৃণালকান্তি প্রামাণিকের স্ত্রী রমারানি দেবীও একজন সুকথিকা। গন্ধবণিক পরিবারের তাঁর জন্ম ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে (১৯৪৮ খ্রি) পিতা আদিনাথ দাঁ এবং মাতা অন্নপূর্ণা। জন্মস্থান কেতুগ্রাম থানার মাসুন্দি গ্রাম। পাশের গ্রামের রাজুর বান্ধব উচ্চতর বিদ্যালয়ে

নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা। ১৯৭০ সালে বিবাহ।

ছোটোবেলা থেকেই পারিবারিক ধর্মীয় পরিমন্ডলে মানুষ হওয়ার সুবাদে অত্যন্ত ভক্তিমতী। বাল্যকালে গ্রামের কৃষ্ণযাত্রায় অভিনয় করতেন। সেকারণে তাঁর মঞ্চভীতি কখনই ছিল না। স্বামীর প্রতিটি কথকতার আসরে তিনি হাজির থাকতেন বরাবর এবং সেখান থেকেই তাঁর কথকতার শিক্ষা শুরু। তবে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কথকতার পূর্ণ সুযোগ তিনি পেতেন না।

দুই পুত্র বড়ো হয়ে যাওয়ার পর মোটামুটি ১০১২ বছর আগে তিনি একভাবে আসরে কথকতা শুরু করেন। প্রথম আসর হয় আতুহাটপাড়ার শিবতলায়। এখন তো নিয়মিত কথকতা করেন। তবে এর পিছনে তাঁর স্বামীর অনুপ্রেরণাই মূল। প্রতিটি আসরের আগে বাড়িতে রীতিমত পড়াশোনা করে তৈরি হয়ে যান। ছোটবেলায় যে গান শিখেছিলেন সেটা কথকতার ক্ষেত্রে দারুণ কাজে লাগে। মূলত ভাগবত থেকে পাঠ করেন, তবে আনুষঙ্গিক শাস্ত্রাদি থেকেও উদাহরণ ও উদ্ধৃতি দিতে হয়। বেশি কাজে লাগে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত ও নানান পুরাণ। ভজন, কীর্তন, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত এসবও কথকতার সঙ্গে মিশে যায় প্রায়শ। সোমবার আতুহাটপাড়ার শিবতলায় এবং শনিবার গৌরাঙ্গপাড়ার রাধাকান্ত বাড়িতে নিয়মিত সন্ধ্যা ছ'টায় পাঠ করেন। এছাড়াও আমন্ত্রিত পাঠ আছে। কোনও সাম্মানিক নেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরামিষাশী এবং গৃহদেবতার পূজা নিজেই করেন। স্বামীর সঙ্গে কখনও যৌথভাবে কথকতা করেননি। যদিও তিনি স্বামীর সুযোগ্য শিষ্যা। কাটোয়া আতুহাটপাড়ায় মৃণালকান্তি প্রামাণিক এবং রমারানি প্রামাণিকের নিজস্ব বাসভবন রয়েছে।

বেণুরানি দাস : কাটোয়া মহকুমার গোঁড়াগোপালপুর গ্রামের নিত্যহরি দাস ছিলেন খ্যাতিমান কীর্তনীয়া এবং পাঁচালি গায়ক। দূরদর্শনে গাইতেন এবং বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। মূলগায়েন হিসেবে নিজেই কীর্তনের দল গড়েছিলেন। ওদিকে তাঁর স্ত্রী কমলা দাসী ছিলেন নবদ্বীপের কন্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞ মহিলা। নিত্যহরি ও কমলাদেবীর কন্যা হলেন বেণুরানি দাস। স্বভাবতই তিনিও যে একজন সার্থক কথক গায়িকা হলেন তাতে সন্দেহ কী।

বেণুরানি গাঁফুলে পঞ্চাননতলা হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করতে করতে কাটোয়া তাঁতিপাড়ার আদি বাসিন্দা সূর্যময় দাসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জাতিতে তন্তুবায় হলেও সূর্যময়বাবু আসলে ছিলেন ব্যবসায়ী। বেণুরানির বর্তমান বয়স ৫৯ বছর। আট বছর পূর্বে তাঁর স্বামী এবং কন্যা মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি অন্তর্মুখী এবং পরিপূর্ণ রূপে প্রচারবিমুখ হয়ে রয়েছেন। স্বভাবতই তখন থেকে আসরে কথকতাও বন্ধ। নিজের ছবি প্রকাশেও অনিচ্ছুক। চরম দুঃখ এই যে-কথকতার শুরুটা হয়েছিল মূলত স্বামীর উৎসাহেই।

কথক রামমোহন গোস্বামী হলেন তাঁদের পারিবারিক বন্ধু এবং খুবই অন্তরঙ্গ। কথকতার শিক্ষা তাঁর কাছেই। প্রথম প্রথম তাঁর সহযোগী হিসেবে, পরে এককভাবে। রামমোহনবাবুর অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহই মূল পাথেয়। কথকতার ক্ষেত্রে তাঁর পৈতৃক শিক্ষাটাও কাজে লেগে যায়।

প্রচুর বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়াশোনা করেছেন এবং এখনও নিয়মিত করেন। কাটোয়ার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ভাগবত পাঠ - করতে তিনি যেতেন তাঁর স্বামীসহ। কাটোয়ায় বিভিন্ন মন্দিরে তো করতেনই। কাটোয়া রাধামাধব বাড়িতে তাঁর কথকতা শুনে হরিনাম সংঘ, কাটোয়া গৌরাঙ্গ মন্দির থেকে ১৪১২ বঙ্গাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তাঁকে সম্মাননা দেওয়া হয়

রূপশ্রী বিশ্বাস : নদিয়া জেলার ভাগ্যবন্তপুরের নিকট ছুটিপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মনোজ দাস এবং তাঁর স্ত্রী মায়ারানি দাস। তিনি গান্ধিজির সঙ্গে সঙ্গে ফোটো তুলে বেড়াতেন। তাঁদের কন্যা হলেন রূপশ্রী বিশ্বাস। জন্ম ২৮শে কার্তিক ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। ১৯৭২ সালে তিনি স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। কিন্তু তার আগেই ১৯৭১ সালে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় কাটোয়া সিদ্ধেশ্বরী নিবাসী সোমনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে। কাটোয়ার বৈষ্ণব পরিমন্ডলে বিভিন্ন মন্দিরে তিনি নিয়মিত কথকতা শুনতে যেতেন সন্ধ্যাবেলায়। ক্রমে কথকতার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কথকদের পাঠ শুনে শুনে তিনি বিষয়টা নিজে নিজেই রপ্ত করতে থাকেন। সঙ্গে চলতে থাকে বাড়িতে বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ। এইভাবেই তাঁর কথকতার শিক্ষা পাননি। তবে শ্বশুরবাড়ির সকলের কাছ থেকে পেয়েছেন প্রবল উৎসাহ। শ্বশুরকুল ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরাগী। তাঁর স্বামীও তাঁকে কথকতার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকেন।

এক পুত্র এবং এক কন্যা বড়ো হয়ে যাওয়ার পর প্রায় ১০/১২ বছর আগে থেকে কাটোয়া নিশুবাবুর বাড়িতে প্রথম কথকতা করেন। সুভাষ ঠাকুর, রামমোহন গোস্বামী, পরেশ অধিকারী প্রমুখের কথকতা শুনে তিনি এই কাজে উদ্বুদ্ধ হন। আতুহাটপাড়া শিবমন্দিরে মঙ্গলবার (৪.৩০ মি), লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে বুধবার (৪.৩০মি) এবং রাধাকান্ত মন্দিরে শুক্রুবার (৬.৩০ মি) নিয়মিত কথকতা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন মন্দিরে কথকদের অনুপস্থিতিতে তাঁকে কথকতা করতে হয়। কাটোয়ার বাইরে কখনও পাঠ করতে যান নি। কোনও দক্ষিণা বা সম্মানের আশায় নয় শুধু নিজের ভালো লাগার জন্যই তিনি পাঠ করেন। এতে নিজের ধর্মাচরণও হয় আবার অনেক মনুষকে ধর্ম পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়। এটাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। মূলত ভাগবত থেকে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন। সহয়ক গ্রন্থঘুলি তো আছেই। তবে মূলগ্রন্থ হিসেবে চৈতন্য চরিতামৃত, বৈষ্ণব গ্রন্থ াাদি এবং রামায়ণ পাঠ করেন। সময় বিশেষে অন্য পুস্তকও বাদ যায় না। পাঠের সঙ্গে গাড়ও গাইতে হয় কখনও।

সংসারের সমস্ত কাজ সামলে গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ ও সতীমা (কর্তাভজা)-র সেবা সামলে বাড়িতে পড়াশোনা করার সময় বিশেষ পান না যদিও ইচ্ছা থাকে প্রবল। ব্যক্তিগত জীবন ৩০ বছর যাবৎ নিরামিষাশী এবং ভক্তিপরায়ণা। শ্রোতাদের সঙ্গে বিতর্ক সবিনয়ে এড়িয়ে যান। তবে শ্রোতাদের প্রশংসা তাঁর ভালো লাগে। তাঁর বংশধরেরা কথকতা বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয়, এটা তাঁর দুঃখ। হরিনাম সংঘ, কাটোয়া গৌরাঙ্গ মন্দির থেকে ১৪১৪ বঙ্গাব্দের ৪টা আষাঢ় কথকতার জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। এটা তাঁর কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।